ডেঙ্গু কথন

নাসরীন মুস্তাফা, কথাসাহিত্যিক ও নাট্যকার

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদস্য দেশগুলোতে ডেঙ্গু মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ছে। বৃষ্টি, তাপমাত্রা আর অপরিকল্পিত অতিদ্রুত ঘটে যাওয়া নগরায়নের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে এডিস ইজিপটি নামের এক দজ্জাল মেয়ে মশা দাপটের সাথে ডেঙ্গু নামের ভাইরাল জ্বর ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে, সাথে ছড়াচ্ছে চিকনগুনিয়া, হলুদ জ্বর আর জিকা সংক্রমন।

চীনের জিন শাসনামলে (২৬৫-৪২০ খ্রিষ্টপূর্ব) একটি মেডিকেল এনসাইক্লোপেডিয়াতে ডেঙ্গু জ্বরের উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এটাই ডেঙ্গু জ্বরের প্রথম উল্লেখ। উড়ন্ত পতঙ্গ 'পানিবাহিত বিষ' ছড়িয়ে এই জ্বর বাঁধায় বলে বলা হয়েছিল কারণ হিসেবে। ১৭৮৯ সালে বেঞ্জামিন রাশ রোগটিকে চিহ্নিত ও নামকরণ করার ঠিক পর পরই ডেঙ্গুর প্রথম মহামারী ছড়িয়েছিল ১৭৮০ সালে, একই সাথে এশিয়া-আফ্রিকা আর উত্তর আমেরিকাতে। তখনো সব মানুষের ভেতর ভয় ছড়িয়ে পড়েনি। মিডিয়ার বিস্তার লাভের কারণে ১৯৫০ সালে ফিলিপাইন আর থাইল্যান্ডে ডেঙ্গু জ্বরটি আতংক ছড়িয়ে নজরে এসেছিল। এখনো ডেঙ্গু বেশিরভাগ এশিয়ার আর লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে শিশুমৃত্যুর অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক গবেষণায় দেখা গেছে, ১২৮টি দেশের প্রায় চার বিলিয়ন মানুষ ডেঙ্গু ভাইরাসের হুমকিতে আছে। সদস্য দেশগুলো এই সংস্থাতে নিয়মিত আক্রান্তের সংখ্যা জানিয়ে রিপোর্ট করছে এবং তাতে জানা গেছে, প্রতি বছর আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, প্রতি বছর ডেঙ্গুর তীব্রতাও বাড়ছে, বদলে যাচ্ছে লক্ষণ এবং এর ফলে মানুষের স্বাস্থ্য এবং জাতীয় অর্থনীতিতেও পড়ছে উদ্বেগজনক প্রতিক্রিয়া। দেশে দেশে ভ্রমণে যাওয়া ডেঙ্গু ভাইরাসবাহী মানুষের মাধ্যমে ছড়াচ্ছে রোগটি। যত দিন যাচ্ছে, তত বেশি ছড়াচ্ছে। ১৯৭০ সালের আগে মাত্র নয়টি দেশে তীব্র ডেঙ্গু আক্রমণের ঘটনার কথা জানা ছিল। এখন আফ্রিকা-আমেরিকা-পূর্ব ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণ এশিয়া-দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার একশ'টি দেশে ডেঙ্গু তীব্র আতংকের নাম। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রাপ্ত তথ্যমতে ২০১৫ সালে কেবল আমেরিকাতেই ২.৩৫ মিলিয়ন মানুষ ডেঙ্গু রোগের ভাইরাস নিয়ে হাসপাতালে এসেছিলেন, এর মধ্যে ১০,২০০ কেস ভয়াবহ হিসেবে ধরা পড়েছিল, মৃত্যু বরণ করেছিলেন ১,১৮১ মানুষ। ২০১০ সালে ফ্রান্স আর ক্রোয়েশিয়াতে প্রথম ডেঙ্গু রোগি পাওয়া যায়। ইউরোপের অন্য দেশগুলোতেও ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে রোগটি। ম্যালেরিয়ার পরে এই ডেঙ্গুকেই ধরা হচ্ছে কষ্টদায়ক জ্বরের উৎস হিসেবে।

২০১৭ আর ২০১৮ সালে আমেরিকাতে ডেঙ্গু রোগির সংখ্যা কমে গেল। জিকা ভাইরাসের আক্রমন গেল বেড়ে। কেন এমন হ'ল, তার ব্যাখ্যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এখনো দিতে পারেনি। আবার এই কমে যাওয়া তীব্রতা কেন আবার বেড়ে ২০১৯ সালে চরম আতংক সৃষ্টি করল, তারও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা মেলেনি। ২০১৯ সাল ডেঙ্গু জ্বরের তীব্রতা সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশে আমরা হাড়ে হাড়ে অনুভব করছি এর আতংক। অস্ট্রেলিয়া, কম্বোডিয়া, চীন, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনাম, কঙ্গো, তানজানিয়া- মোট কথা এশিয়া-আফ্রিকা-আমেরিকা-ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে আতংক। ফিলিপাইনের যে সব এলাকায় ডেঙ্গু মহামারী আকারে ছড়িয়েছে, সেসব এলাকায় জাতীয় দুর্যোগ ঘোষণা করা হয়েছে।

কোন কোন দেশ ডেঙ্গু আতংক সামলাতে দক্ষতার পরিচয় দিতে পারলেও বৈশ্বিক বিচারে দক্ষতার মান হতাশাজনক। বাংলাদেশেই আমরা দেখছি, মশা মারা ঔষুধ কাজ করছে না, ডেঙ্গু রোগ হ'ল কি না তার পরীক্ষা করতে এবং হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা নিতে সমস্যায় পড়ছেন রোগি। একের পর এক হাসপাতালে ছুটছেন রোগির স্বজনরা, ভর্তি করাতে পারছেন না। চিকিৎসকরা অমানুষিক পরিশ্রম করেও কুলিয়ে উঠতে পারছেন না। অক্টোবর পর্যন্ত ডেঙ্গু রোগের মহামারী-কাল, ততদিন পর্যন্ত কীভাবে এই সমস্যা সামাল দেওয়া যাবে, তা নিয়ে সত্যিই দুঃশ্চিন্তায় আছি আমরা।

এডিস ইজিপটি মশা ডেঙ্গু রোগের প্রাথমিক বাহক, ভাইরাসবাহী স্ত্রী মশা মানুষকে কামড়ে রক্ত চুষে নিলে ভাইরাসটি মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। ভাইরাসবাহী মানুষের রক্ত যে মশা পান করবে, সেও হয়ে যাবে বাহক। এই মশার শরীরে ৪ থেকে ১০ দিন ভাইরাসটি সুপ্তাবস্থায় থাকার পর মশাটি তার বাকি জীবনে ভাইরাস ছড়িয়ে দিতে সক্ষম থাকে। আর ভাইরাসবাহী মানুষটি নিষ্পাপ থাকা এডিস মশাদের শরীরে ভাইরাস ছড়িয়ে দিতে সক্ষম। খুব সকালে আর সূর্যাস্তের আগে আগে মশার রক্তপানের হার বেড়ে যায়। ভাঙ্গা আসবাবপত্র, ফেলে দেওয়া গাড়ির টায়ার, জমানো ক্যানের পানিতে এডিস মশা ডিম পাড়ে। আবার শুকনো জায়গাতেও বছর ধরে টিকে থাকতে পারে ডিম, পানি পেলেই পেয়ে যায় রোগ ছড়ানোর সুযোগ। লক্ষ্য করুন, অন্য মশারা অন্য প্রজাতির প্রাণীকে কামড়ালে এডিশ মশার পছন্দ কেবল মানুষ।

এশিয়ার সেকেন্ডারি ডেঙ্গু ভাইরাস বাহক এডিস আলবোপিকটাস উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপের ২৫টিরও বেশি দেশে ছড়িয়েছে ব্যবহৃত টায়ার এবং সৌভাগ্য এনে দেওয়া বাঁশগাছের মতো পণ্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণে। এডিস আলবোপিকটাস ইউরোপের ঠান্ডার মধ্যে বেঁচে থাকতে সক্ষম, অন্যদিকে এডিস ইজিপটি গরম আবহাওয়ায় উপযুক্ত। এর অর্থ পরিষ্কার। গরম বা ঠান্ডা, যে কোন অঞ্চলই আর নিরাপদ নেই। আর সত্যটা এরকম, ডেঙ্গু জ্বরের কোন নির্দিষ্ট চিকিৎসাপদ্ধতি মানুষ আবিষ্কার করতে পারেনি। ডেঙ্গুর টিকা ডেঙ্গভাক্সিয়ার লাইসেন্স ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে দেওয়া হয়, বিশ্বের ২০টি দেশে ৯ থেকে ৪৫ বছর বয়সীদের জন্য ব্যবহার শুরু হয়। ২০১৬ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সতর্কবার্তা জারি করে টিকা ব্যবহার বিষয়ে। সন্দেহ হলেই টিকা দিয়ে নিশ্চিত থাকা যাচ্ছে না, কেননা টিকা দিলে ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত নন এমন রোগির আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় শতকরা ৭০ ভাগ। আক্রান্ত হওয়ার লক্ষ্মণ শতভাগ বুঝতে পারা, আক্রান্ত থেকে অ-আক্রান্ত রোগিকে বেছে আলাদা করার শতভাগ সক্ষমতা অর্জনের কাজ এখনো সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

করণীয় কি তবে? সরকারি প্রচারণা থেকে স্পষ্ট, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে এডিশ মশাকে ডিম পাড়তে না দেওয়ার কাজটা খুব জরুরি। কেবল জমে থাকা পানি ফেলে দিলেই চলবে না। বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সলিড ওয়েস্ট ঠিকঠাকভাবে সরিয়ে নিতে হবে। এতে মানুষের তৈরি করা মশার ডিম পাড়ার উপযোগী কৃত্রিম প্রজননক্ষেত্র ধ্বংস করা সহজ হবে। শুকনো জায়গাতেও যে মশার ডিম টিকে থাকে বছর ধরে! দিনের বেলায় হাত-পা ঢেকে রাখা জামা পরা, জানালায় নেট লাগানো, এসব কাজও জরুরি। গণসচেতনতা তৈরির পাশাপাশি পর্যাপ্ত গবেষণা হওয়া দরকার। এ বছর বেঁচে গেলাম তো ভুলে গেলাম, তা চলবে না। মনে রাখতে হবে, প্রতি বছর রোগের তীব্রতা বাড়ছে। আগামি বছরের প্রস্তুতি নিতেই হবে এখুনি। মনে রাখতে হবে, হুট করে কোন সিদ্ধান্তে আসা ঠিক হবে না। বিশ শতকে ম্যালেরিয়া ঠেকাতে মশা মারতে ডিডিটির ব্যবহার বেড়ে গেল, যার দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি বহন করতে হয়েছে পরিবেশকে, তথা মানুষকে। সম্প্রতি পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে আবারো ম্যালেরিয়া ছড়িয়ে পড়তে দেখা যাচ্ছে এবং ম্যালেরিয়ার সর্বোচ্চ চিকিৎসা প্রয়োগের পরও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না। মশারা মানুষের সর্বোচ্চ চিকিৎসা-সক্ষমতাকে হজম করতে শিখে গেছে।

কেন এমন হচ্ছে? মনে রাখতে হবে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রকৃতির বিধ্বংসী রূপ কেবল সাইক্লোন-বন্যার মাধ্যমে নয়, রোগবালাই দিয়েও প্রকাশ পাচ্ছে। বাংলাদেশ-ব্রাজিলের মতো উষ্ণ আবহাওয়ার দেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটছে, তা নিয়ে সম্প্রতি একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে নেচার মাইক্রোবায়োলজি পত্রিকায়। গবেষণাপত্রটির সহলেখক লন্ডন স্কুল অব হাইজিন এন্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক অলিভার ব্রান্ডি বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আগামী বছরগুলোতে আরো বেশি মানুষ ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হবে। যদিও এই দেশটির সাবেক রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পসহ অনেকে আদৌ স্বীকার করেন না জলবায়ু পরিবর্তনের বাস্তবতা।

অলিভার ব্রান্ডি এবং তাঁর সহকর্মীরা মশার আচরণ আর মানুষের নগরায়নের বিস্তার নিয়ে তথ্য-উপাত্ত যাচাই করে সারা বিশ্বের মানুষদের আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছেন এরকম, ২০১৫ সালে যত মানুষ আক্রান্ত হয়েছিলেন, ২০৮০ সাল নাগাদ তার চেয়ে অতিরিক্ত ২ বিলিয়ন মানুষ ডেঙ্গুর ঝুঁকিতে থাকবে। এই মানুষগুলো কিন্তু আমাদের সন্তান-সন্ততি-নাতিপুতি। নিজের জান বাঁচানোর তাগিদে অস্থির আমরা ভাবছি না পৃথিবীর যে হাল হচ্ছে, তাতে ওরা বাঁচবে কীভাবে? এরকমটি ভাবেননি আমাদের বৈশ্বিক পূর্বপুরুষরাও। সচেতনতা ছিল না তাদের। আমাদেরও কি নেই? আছে বলে ভরসা পাচ্ছি না। এখনো বিশ্বের সবাই কার্বন নিঃসরনের হার শূন্যতে নামিয়ে আনার সিদ্ধান্তে একমত হতে পারেনি। কবে হবে, তারও নিশ্চয়তা নেই। কার্বন নিঃসরন চলতে থাকবে আর আমরা ডেঙ্গু রোগ থামিয়ে দেওয়ার জাদুকরকে খুঁজতে থাকব, তা তো হয় না। পিএলওএস নেগলেকটেড ট্রপিক্যাল ডিজিজেজ শীর্ষক জার্নালে প্রকাশিত আরেক গবেষণা পত্রে দাবী করা হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে এরকম প্রাণঘাতী রোগের সংখ্যা আরো বাড়বে। কত জাদুকর পাব আমরা?

এখন প্রতি বছর প্রায় ১০ হাজার মানুষ ডেঙ্গু রোগে মৃত্যু বরণ করছেন। ভবিষ্যতে এর সংখ্যা আর বাড়বে না, এমন প্রচেষ্টা সফল হোক। ভয় ধরানো গবেষণার উল্টো দিকে আশা জাগানো আরেক গবেষণার তথ্যও পাওয়া গেল ২০১৯ সালের ১০ জুন তারিখে নেচার মাইক্রোবায়োলজি পত্রিকায়। বৈশ্বিক উষ্ণতার ফলে এখন থেকে ৬০ বছর পর ভারতে নাকি ডেঙ্গু রোগের প্রকোপ অনেক কমে যাবে। ২০৮০ সালে বিশ্বের অনেক জায়গায় এ রোগ প্রাণঘাতী হয়ে উঠলেও ভারতে কেন তেমনটি ঘটবে না? বলা হচ্ছে, এডিস মশারও তো গরম সহ্য করার সীমা আছে। আগামী বছরগুলোতে ভারত এ্যাত্তো বেশি গরম হয়ে উঠবে যে এডিস মশা এর থেকে কম গরমের দেশে উড়ে যাবে। হয়তো তীব্র গরমে জমে থাকা পানি শুকিয়ে যাবে বলে এডিস মশার ডিম ফুটে লার্ভা বেরুতে কষ্ট হবে। গবেষণাপত্রটির সহলেখক অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক জেন পি মাসিনা ইন্ডিয়া টুডে পত্রিকার সাথে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ২০৮০ সালে বিশ্ব প্রাক-শিল্প যুগের তাপমাত্রার চেয়ে আরো ২ ডিগ্রি বেশি উত্তপ্ত হয়ে উঠবে এবং এই উত্তপ্ত পৃথিবীতে মশাদের আচরণ কেমন হবে তা যাচাই করে এরকম ধারনা প্রস্তুত করা হয়েছে। ২০১৭ সালে বিজ্ঞানী শ্রীনিবাস রাও মুথেনেনির গবেষণায় উঠে এসেছে, গত ১০০ বছরের তুলনায় গরম কালে ভারতের তাপমাত্রা বেড়েছে ০.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং শীতকালে ১.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ভারতের

আবহাওয়া মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে তীব্রভাবে প্রভাবিত। অসময়ের বৃষ্টিপাত, থেমে থেমে বৃষ্টিপাত এই অঞ্চলে মশাদের প্রজনন সক্ষমতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। তবে তাপমাত্রা আরো বেড়ে গেলে এডিস মশাই উল্টো বিপদে পড়ে যাবে। মশার শরীরে ভাইরাসের পরিপুষ্টতার জন্য প্রয়োজনীয় সময় না পেলে আক্রান্ত করার হার কমে যাবে।

খুশি হতে পারছি না। এডিস মশা যাতে বিপদে না পড়ে আরো সক্ষম হয়ে ওঠে, সে সহায়তা করার জন্য মানুষই আছে। বুঝে-না বুঝে মানুষ পৃথিবীর রক্ষাকর্তা হতে পারেনি। কেবল নিজে বাঁচতে চেয়েছিল বলে যা কিছু করেছে, তা ক্রমশঃ মানুষেরই মৃত্যুবান হয়ে এগিয়ে আসছে। আফসোস!

#

পিআইডি ফিচার